(১) শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ)।
(২) জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো (পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি)।
(৩) খান আবদুল কাইয়ুম খান (পাকিস্তান মুসলিম লীগ)।
(৪) জনাব নূরুল আমিন (পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)।
(৫) মিয়া মমতাজ দৌলতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)।
(৬) খান আবদুল ওয়ালী খান (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)।
(৭) মওলানা মুফ্তী মাহমুদ (জামিয়াত-উল-উলামা-ই-ইসলাম)।
(৮) মওলানা শাহ্ আহমদ নরানী (জামিয়াত-উল-উলেমা-ই-পাকিস্তান)।
(৯) জনাব আবদুল গফুর আহমদ (জামাত-ই-ইসলামী)।
(১০) জনাব মোহাম্মদ জামাল কোরেজা (পাকিস্তান মুসলিম লীগ—কনভেনশন)।
(১১) মেজর জেনারেল জামাল দার } সীমান্ত এলাকার
(১২) মালিক জাহাঙ্গীর খান } প্রতিনিধি।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণার আরো বলা হয়—"সম্মেলনের পর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসা কেনো যে সম্ভব হবে না প্রেসিডেন্ট তার কারণ দেখছেন না।"

শেখ মুজিবুর রহমান একই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখানের কথা ঘোষণা করেন।

যারা পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতা বৃদ্ধি এবং জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান "অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন" সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারী করা শুরু করেন। তিনি খাজনা-বন্ধ অভিযানের কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাপক ঐক্যমত ছাড়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন: "আমি এ কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পরে কি ঘটবে তাতে কিছু যায়-আসে না কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী যতদিন আমার ক্যমাণ্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি বজায় রাখবো। এ ব্যাপারে কেউ যেন কোন সন্দেহ কিংবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশা করবো না।"

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চার দফা দাবী পেশ করেন এবং তা আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৫শে মার্চে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে আরোপ করেন।

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব খবর বেরিয়েছে তাতে তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে "লণ্ডন টাইমস" লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে 'বাঙালী' জাতির কথা উল্লেখ করেন। 'লিভারপুল ডেইলী পোষ্ট' ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন, "হোয়াইট হলে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে স্বাধীন বাঙালী মুসলিম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে এখন আর পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন না, বলছেন বাঙালী প্রজাতন্ত্রের কথা। হোয়াইট হলে এটা অনুধাবন করা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকার একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশবিভক্তির মারাত্মক সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন।"

"ওয়াশিংটন পোষ্ট" ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের ২রা মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তাতে লিখেছেন, "আওয়ামী লীগের প্রেসিডেণ্ট শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাড়াহুড়ো করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের ৭ তারিখে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করবে এবং এই সভায় তিনি বাঙলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী প্রদান করবেন। তিনি স্বাধীনতা দাবী করবেন কিনা একথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "অপেক্ষা করুন।" এমন কি এর আগেও ১৯৭০ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "স্বাধীনতা, না, এক্ষুণি নয়।"

লণ্ডনের "ডেইলী টেলিগ্রাফ" ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ সংখ্যায় লিখলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা একরকম ঘোষণাই করেছেন, ২৫শে মার্চে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদত্ত ৪-দফা দাবীর মধ্যেই এ কথা লুক্কায়িত রয়েছে, কাজে কাজেই প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান পারেন না এসব দাবী পূরণ করতে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর আন্দোলনকে "স্বাধীনতার আন্দোলন বলে অভিহিত করে জাতীয় পরিষদে সহযোগিতার জন্যে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন না।" একইদিনে "ডেইলী টেলিগ্রাফ" এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য নামকরণ শুনছি যা 'বাংলাদেশ' কিংবা 'বঙ্গভূমি' হতে পারে। এর পতাকাও বানানো হয়ে গেছে।"

১৯৭১ সালের ১৩ই মার্চে "লণ্ডন ইকোনমিষ্ট" লিখেছেন, প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ২৫শে মার্চ তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জবাবে তিনি (শেখ মুজিব) চারটি শর্ত আরোপ করেন যা তাঁর এবং আওয়ামী লীগের অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে দু'টি শর্ত যেমন, 'অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার' এবং 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর' কার্যতঃ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মেনে

নেয়া অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই পরিস্থিতির একটা নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবার জন্যে (যেটা হয়তো তাঁর শেষ বৈঠকও হতে পারে) খুব শিগ্‌গীরই ঢাকা যাচ্ছেন।"

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ অর্থাৎ যেদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আরো আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকা গমন করলেন সেদিন "টাইম" সাময়িকী নিউ ইয়র্ক থেকে লিখলেন, আসন্ন বিভক্তির (পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণতকরণ) পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব)। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব "টাইম"-এর সংবাদদাতা ডন কণিনকে বলেন, বর্তমান পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোন আশা নেই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা বলেন এবং জানান যে তার অনুগামীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর দিতে অস্বীকার করেছে যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ভাষায় 'বাংলাদেশে'র স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।...এর দু'দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে বলেন, "আমি তাদেরকে পছন্দ করে দেব এবং তাদেরকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করবো।" এ ধরনের একটি বিবৃতির পর সোজাসুজি স্বাধীনতা ঘোষণা আর অতি নাটকীয় কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংকট ঘনীভূত হলো

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিলো এই:

(১) আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের দরুন আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়েছিলো।

(২) ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট ছাড়াও, আওয়ামী লীগের হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। ভিন্নমতপোষণকারীদের তারা আক্রমণ করলো। ৩রা মার্চ চট্টগ্রামে ও ৫ই মার্চ খুলনায় আক্রমণের ফলে শত শত লোক হতাহত হলো।

(৩) শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করে, একের পর এক এমন কতকগুলো নির্দেশ জারী করলেন, যার ফলে প্রশাসন, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হলো।

(৪) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে হিন্দুস্তানী সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধি পেলো।

এই শ্বেতপত্রের পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ৪-দফা দাবী তার বিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্টতর করলো। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আর একদফা শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্যে ১৫ই মার্চ ঢাকা গেলেন।

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবী ছিলো এই:

(১) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা;
(২) অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া;
(৩) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত, এবং
(৪) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই)।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আওয়ামী লীগ নেতা কিন্তু এমন কোন আশ্বাস দেননি যে এই দাবীগুলো মেনে নিলেই তিনি ২৫শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেবেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন: এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, তখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো যে আমরা অধিবেশনে যোগ দেবো কিনা।"

১৬ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার ৪-দফা দাবী পেশ করলেন। এরপর তিনি আওয়ামী লীগ "হাই কমাণ্ড"-এর সংগে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সেইদিনই তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে "পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্গে পরিণত করার জন্য" পুনরায় আহ্বান জানানো হলো।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মত তিনি সর্বদাই পোষণ করে আসছেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের একটি টীম প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। আওয়ামী লীগের এই টীমে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এই বৈঠকে আলোচিত হলো। এতে একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রস্তুত করা হলো। এই আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সদস্য বাছাই করে একটি উজীর-সভা গঠিত হবে। এই উজীর-সভা প্রাদেশিক গভর্ণরকে তাঁর কর্তব্যপালনে সাহায্য করবেন ও পরামর্শ দেবেন। এই সামরিক আইন বিধিতে এমন ব্যবস্থাও রাখা হলো যে সামরিক আইন কার্যকরী থাকবে অন্তরাল থেকে।

এই সময়ে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক একটি আদেশ জারী করলেন। এই আদেশবলে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হলো। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখে কোন্ পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়েছিলো---সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এই কমিশন নিয়োগ করা হলো। শেখ মুজিবের ৪-দফা দাবীর অন্তর্গত তৃতীয় দফার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

সামরিক আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারপতি এই কমিশনের প্রধান হবেন। এতে ৪জন সদস্য থাকবেন। এই ৪জন সদস্য নেওয়া হবে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী থেকে।

১৮ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে একটি বিবৃতি দিলেন। এই তদন্ত কমিশন ছিলো তাঁর ৭ই মার্চের ৪-দফা দাবীর তৃতীয় দফা। শেখ মুজিব বললেন: "আমরা এ ধরনের একটি কমিশনকে গ্রহণ করতে পারি না। বাংলা দেশের লোকেরা এমন একটি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না বা এর সদস্যও হবে না।" তিনি আরও

বললেন: "একটি সামরিক আইনবিধির অধীনে এই কমিশনের নিয়োগ, এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার বিধান—দুটোই আপত্তিজনক।"

১৯শে মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি পীড়াপীড়ি করলেন যে খসড়া সামরিক আইন বিধি চালু থাকাকালীন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে থাকবে এক একটি পূর্ণাংগ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। তিনি সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করারও দাবী জানালেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেণ্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সহকারীদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগ টীমকে জানানো হলো যে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা যদি বাতিল করা হয় তাহলে যে দলিলের বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোন আইনগত বৈধ্যতা থাকবে না। সুতরাং দেশে সৃষ্টি হবে একটি শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা। একথাও ব্যাখ্যা করা হলো যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার অধিকারবলেই প্রেসিডেন্টের পদেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বললেন যে এগুলো রাজনৈতিক বিষয় এবং "রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই" এগুলোর সমাধান হওয়া উচিত। ডক্টর কামাল হোসেন প্রস্তাব দিলেন যে জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার ক্ষমতাবলী ত্যাগ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করতে পারেন।

এই বৈঠকের পর, আওয়ামী লীগের দাবী আইনগতভাবে যথাসম্ভব পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের টীম অন্য একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রণয়ন করলেন। এই সামরিক আইন বিধিতে নিম্নলিখিত বিধানগুলো ছিলো:

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীর-সভা গঠন।

(২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহকে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান।

(৩) সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও সামরিক বিচারালয়ে ইত্যাদির বিলোপ সাধন।

কিন্তু আইনগত শূন্যতা যাতে ঘটতে না পারে, সেজন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বহাল থাকবে। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় প্রেসিডেণ্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে সাক্ষাতের জন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা সেইদিন ঢাকা পৌঁছলেন। এই নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন---কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও সর্দার শওকত হায়াত খান এবং জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফ্তী মাহমুদ।

২০শে মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী লীগ জয়দেবপুরে সামরিক সরবরাহ বহনকারী একটি কনভয়কে বাধা দিয়ে এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানী জাহাজ "এম. ভি. সোয়াত"-এর চলাচল ব্যাহত করে যে সাংঘাতিক উস্কানীকে প্রশ্রয় দিলো---তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট তাঁদের সংগে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। বেলা ১০টায় প্রেসিডেন্টের সংগে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। প্রেসিডেন্টের সংগে ছিলেন তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ। শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে স্পষ্টভাবে জানালেন যে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে সকল রাজনৈতিক নেতার স্বার্থহীন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই তিনি কোন পরিকল্পনার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা মত প্রকাশ করলেন যে, কোন দলিলের বলে সামরিক আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করলে---সে দলিলটির কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও তাঁর সহকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাটির পেছনে কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা তা আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ তাদের মতের সমর্থনে একজন শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞকে (জনাব এ. কে. ব্রোহী) পেশ করার ভার নিলেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাবৃন্দ ও শেখ মুজিবের সহকারীদের মধ্যে পরবর্তী আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো গৃহীত হলো:

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

(২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীরসভা গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও থাকতে হবে।

(৪) পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(৫) এইসব ব্যবস্থার বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

একথা উল্লেখ করা হলো যে, যে-দলিলটির দ্বারা এইসব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কার্যকরী করা হবে, সে দলিলটি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখতে হবে। এটা আইনগত প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর রহমান এতে সম্মত হলেন না।

সেইদিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে জারী করার উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। প্রস্তাবিত দলিলটি যাতে একটি সামরিক আইনবিধির আকারে জারী না করা হয়, এটা আওয়ামী লীগের দাবী ছিলো। আওয়ামী লীগের এই দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের জন্যও খসড়া ঘোষণাটিকে একটি মৌলিক দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে বলে সাব্যস্ত করা হলো। এই ধরনের একটি ঘোষণার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা, এই মূল প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞের সংগে আলোচনার পর নির্ধারণ করা হবে বলে স্থির করা হলো।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বৈধতাসূচক প্রশ্নটির সমাধানসাপেক্ষ, খসড়া ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়গুলো ছিলো:

(১) প্রাদেশিক উজীরসভার সদস্যরা যেদিন শপথ গ্রহণ করবেন, সেইদিন থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর, ১৯৬৯ সালের ৪ঠা এপ্রিলের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্ররূপে গণ্য হবে।

(৩) ঘোষণা জারী হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, অন্তর্বর্তীকালীন সময়েও তিনিই প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(৪) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধান। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশের বিধানসমূহের আওতায় তিনি প্রেসিডেন্টের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ও কর্তব্য পালন করবেন। ১৯৬২-এর শাসনতন্ত্রকে এরপর 'প্রাক্তন শাসনতন্ত্র' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে সদস্য বাছাই করে একটি কেন্দ্রীয় উজীরসভা গঠন করা হবে।

(৬) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে জাতীয় পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশে উল্লিখিত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পালিত হবে।

(৭) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের হাতে। তবে এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে। এ সম্পর্কে সীমারেখা ও পরিবর্তন স্থির করা হবে। (তৃতীয় তফশীলে আইন প্রণয়নে কেন্দ্রের নিরংকুশ ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের তালিকা আছে।)

(৮) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রাদেশিক পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকর্তৃক পালিত হবে ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদকর্তৃক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যে ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে, যে সব বিষয়ে আইন প্রণয়নে জাতীয় পরিষদের ওপর সীমারেখা

আরোপ করা হবে---সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের হাতে।

(৯) প্রেসিডেন্ট প্রদেশের পার্লামেন্টারী গ্রুপসমূহের নেতাদের সংগে পরামর্শ-ক্রমে প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত করবেন। প্রেসিডেন্ট যতোদিন গভর্ণরের প্রতি তুষ্ট থাকবেন, ততোদিন পর্যন্ত গভর্ণর তাঁর পদে বহাল থাকবেন।

(১০) প্রত্যেক প্রদেশে গভর্ণরকে তাঁর কর্তব্য পালনে সাহায্য করার জন্য একটি উজীর-সভা থাকবে এবং মুখ্য-উজীর এই উজীরসভার প্রধান থাকবেন। অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি ছাড়া কাউকেই উজীর নিযুক্ত করা যাবে না।

(১১) ঘোষণা প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা ও ইসলামাবাদে একটি করে দুটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি দুটো পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যে-সব বিশেষ ধারার প্রয়োজন রয়েছে তা' তৈরী করবেন এবং এ-সব ধারা পরে জাতীয় পরিষদের তৈরী করা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(১২) উপরোক্ত কমিটি দুটোর রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।

(১৩) কোন প্রদেশের গভর্ণরের রিপোর্টের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে যখনই প্রেসিডেন্টের মনে হবে যে, এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সেই প্রদেশের সরকারকে দিয়ে কাজ চালানো যাচ্ছে না প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কার্যনির্বাহী সরকারের সব কিংবা যে-কোন ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করতে পারবেন।

একই দিন (২০শে মার্চ, ১৯৭১) কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জমিয়তে উলামার নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

২১শে মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান জনাব তাজুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় উজীরসভা গঠিত হোক এটা তিনি এখন আর চান না। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য পেশের এই পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগ তাদের খসড়া ঘোষণার আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্যে শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও কার্যকরী করতে ব্যর্থ হন।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এলেন।

২২শে মার্চ, ১৯৭১

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান জনাব ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে মিলিত হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকৃতি ঘোষণা করেন তবুও প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে একটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্যে উভয় নেতার উপর তাঁর অভাব খাটান। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন শুরু করার যে আদেশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছিলেন তা বাতিল করা হয়। এটা সাব্যস্ত হয় যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাকে আইনগত দিক থেকে বৈধ করার জন্যে ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করেননি।

একই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করেন যে, সারা পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ তারিখে যে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় তা এবার পূর্ব পাকিস্তানে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হবে।

প্রেসিডেন্ট মিয়া মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াৎ, মওলানা মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং মীর গৌস বক্স বিজেঞ্জোর সঙ্গেও মিলিত হন। তিনি তাঁদেরকে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

এদিকে সংশোধিত খসড়া ঘোষণাটির বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার কাজকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ঘোষণাটি পূর্বাহ্ণেই জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জনাব তাজুদ্দীনের হাতে দেয়া হয়। বিকেল ৬টায় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারী জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী, জনাব জে. এ. রহিম, ডক্টর মোবাশির হাসান, জনাব হাফিজ পীরজাদা এবং জনাব রফি রাজাকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিপিপি প্রতিনিধিরা নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ পেশ করেন :

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর জাতীয় পরিষদের অনুমোদন না থাকলে প্রস্তাবিত ঘোষণার পেছনে কোন আইনগত সমর্থন থাকবে না। সুতরাং তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, হয় ঘোষণাটিকে জাতীয় পরিষদকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হোক্ কিংবা ঘোষণাটি প্রকাশ করা হোক কিন্তু জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা' কার্যকরী করা হবে। অথবা, বিকল্পমূলক ব্যবস্থা হিসেবে, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের আগ পর্যন্ত ঘোষণাটিকে প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক্।

(২) পিপিপি মত প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা ছাড়া এই ঘোষণার কোন মূল্যই থাকবে না এবং আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাইলে এই ঘোষণা তার পথে একটি আইনগত বাধাও হবে না।

(৩) অবশেষে যখন জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন হবে তখন আওয়ামী লীগ কর্তৃক বে-পরোয়াভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োগের সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে পিপিপি প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেন যে, ঘোষণায় এই ব্যবস্থা থাকতে হবে যে, আলাদা আলাদা ভাবে দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের বেশীর ভাগ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া কোন আইন কিংবা শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদে পেশ করা যাবে না।

(৪) তাঁরা মনে করেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকা পরিবর্তনের ক্ষমতা কেবল তালিকাটি সংশোধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং তালিকার প্রতিটি বিষয়ই পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। দেশরক্ষার মতো যে-সব বিষয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মতৈক্য হয়েছে সে-সব বিষয়ে রদবদল করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

(৫) প্রাদেশিক গভর্ণরদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের "সঙ্গে পরামর্শ করে নয়" বরং কেবল তাদের "সুপারিশ অনুসারে" নিযুক্ত করতে হবে। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণর নিজ বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারবেন এই মর্মে যে ধারাটি রয়েছে তা' সংশোধন করতে হবে কেননা তা' প্রতিনিধিমূলক সরকারের ধারণার পরিপন্থী।

(৬) পিপিপি জানতে চান ঘোষণা জারী করার পর LFO-র মর্যাদা কী হবে? এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে ছিলো LFO-কে টিকিয়ে রাখা হবে কি-না তা' জানা।

(৭) পরিশেষে, পিপিপি মনে করেন যে, প্রথমে একক পরিষদ হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং পরে দু'টি কমিটি গঠিত হওয়া উচিত।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

২৩শে মার্চ তারিখে বিভিন্ন সশস্ত্র সমাবেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশ পতাকা উড়ানোসহ এই দিনের ঘটনাবলী অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্টের সহকারীবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ টীমের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে তাঁর তৈরী করা একটি খসড়া ঘোষণাপত্র পেশ করেন (পরিশিষ্ট 'ঙ' দ্রষ্টব্য)। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, বর্ধিত উত্তেজনা এবং পরিস্থিতি চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পিপিপি ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বিধায় আগের খসড়া ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই আলোচনার অগ্রগতি হওয়া উচিত। কিন্তু আওয়ামী লীগ টীম এ-কথা মানতে অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগ টীমকে আরো বলা হয় যে তাঁরা ইচ্ছা করলে মূল খসড়াটিতে আরো কিছু যোগ করা কিংবা তাতে রদবদলের প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ-কথাও মেনে নেননি।

এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের খসড়াটি পরীক্ষা করে দেখা শুরু করা হোল এবং সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হোল। তারপর একটি সান্ধ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হোল এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিচে বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হোল:

(১) আইনগত বাধ্যবাধকতা হচ্ছে যে, এ-ধরনের যে-কোন ঘোষণা সামরিক আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের আগে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত।

(২) আওয়ামী লীগের খসড়ায় বলা হয় যে, একটি প্রদেশে গভর্ণরের শপথ গ্রহণের তারিখেই সেই প্রদেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে এবং ঘোষণার তারিখের পর ৭ দিন পার হলে সারা পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, গভর্ণরকে বরখাস্ত করা যাবে না। আওয়ামী লীগকে বলা হয় যে, এ-তে প্রশাসনিক বিশৃংখলা দেখা দেবে এবং সামরিক আইন যদি প্রত্যাহার করতে হয় তাহলে যে-তারিখে সব প্রদেশের প্রাদেশিক উজীররা শপথ নেবেন সে-তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করাটাই সঙ্গত হবে।

(৩) দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পৃথক পৃথক কমিটি গঠন-সংক্রান্ত যে-ধারাটি আগের ঘোষণায় ছিলো তা আওয়ামী লীগের নতুন খসড়ায় সংশোধন করে বলা হয়, "বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা শপথ নেবেন এবং "বাংলাদেশ" রাজ্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়ে পৃথক পৃথক শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করা হবে।" আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদকে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এই দুই জাতীয় পরিষদে ভাগ করা এবং ফলতঃ তা' বিচ্ছিন্নতার এক শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(৪) আওয়ামী লীগের খসড়ায় আকর্ষণ করে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সদস্যদের যে-শপথ নেয়ার কথা ছিলো তাঁরা তাও বদলেছেন। আইনকাঠামো আদেশ যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যার অধীনে পরিষদের অধিবেশন ডাকার কথা তার ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে একটি শপথ দিয়ে দেয়া হয়েছে। শপথটি এই:

> "আমি সর্বান্তঃকরণে শপথ করছি (বা, ঘোষণা করছি) যে, আমি পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং যে-সব কর্তব্য সম্পাদনের ভার আমি নিতে যাচ্ছি তা' আইনকাঠামো আদেশ, ১৯৭০-এর ধারাসমূহ ও এই আদেশে বর্ণিত পরিষদের আইন-কানুন অনুসারে এবং সব সময়ই পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি কল্যাণ ও সমৃদ্ধির

প্রতি লক্ষ্য রেখে সততা, আমার সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবো।"

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭(৫) অনুচ্ছেদে যে-শপথ দেয়া হয় তা' এই "আমি সর্বান্তঃকরণে শপথ (ঘোষণা) করছি যে, আমি আইনবলে গঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত ও সত্যিকারভাবে অনুগত থাকবো।"

(৫) প্রেসিডেন্টের টীম আওয়ামী লীগ টীমের সঙ্গে তাদের খসড়ার একটি ধারার মারাত্মক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এই ধারার বলা হয় যে পরিষদ "পাকিস্তান কনফেডারেশন"-এর জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন। আওয়ামী লীগ টীমকে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, কনফেডারেশনের মানে হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট এবং এই কনফেডারেশনের ধারণা "আইনকাঠামো আদেশ" এবং আওয়ামী লীগের নিজেরই "৬-দফা"-র বিরোধী কারণ "আইনকাঠামো আদেশ" এবং ৬-দফা দুটোতেই অনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে।

(৬) আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭(৭) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্র বিলটি পেশ করা হলে তিনি তা' অনুমোদন করবেন এবং যে-কোন অবস্থায় বিলটি পেশের তারিখের পর ৭ দিন অতিক্রান্ত হলেই মনে করা হবে যে প্রেসিডেন্ট তা' অনুমোদন করেছেন।" আওয়ামী লীগ টীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলা হয় যে এই ধারাটি আইনকাঠামো আদেশের পরিপন্থী এবং এ-তে করে LFO-তে যে-৫টি শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির কথা বলা হয়েছে তার পরিপন্থী একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচিত প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকার ৪৯টি বিষয়ের পরিবর্তে ১২টি বিষয়ের নাম ছিলো। এর অর্থ এই ছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই ১২টি বিষয়ই হবে কেন্দ্রীয় বিষয় এবং বাদবাকী সব বিষয়ই হবে প্রাদেশিক বিষয়।

(২) এমন কি তৃতীয় তালিকার এই ১২টি বিষয়ের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের প্রস্তাব করেন যেমন, আওয়ামী লীগ খসড়ায় তৃতীয় তালিকার প্রথম নম্বরে শুধু লেখা ছিলো, "পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা" ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ের অধীনে ৫টি উপ-বিষয় ছিলো। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে এই বিষয়ের অধীনে রয়েছে, সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর কারখানাসমূহ প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ, অস্ত্র-উৎপাদন, ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহের কর্তৃত্ব প্রভৃতি।

(৪) বৈদেশিক বিষয়াদি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ব্যবস্থা ছিলো, "বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য বাদ দিয়ে বৈদেশিক বিষয়াদি।" এক্ষেত্রেও

আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ৭টি উপ-বিষয় বাদ দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, তাঁরা বৈদেশিক বিষয়াদির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত নীতিকে পরিবর্তন করেছেন। আওয়ামী লীগ টীম বিদেশে আলাদা আলাদা বাণিজ্য-প্রতিনিধি নিয়োগেরও প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৪(১) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের বিবেচনা ছিলো এতে বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ দেয়া হয়েছিলো। বাদ দেয়া জিনিসগুলোর মধ্যে ছিলো:

(১) এতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কিংবা কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকরিসমূহ বা পদসমূহের কোন উল্লেখ ছিলো না।

(২) খসড়ায় জাতীয় আদমশুমারী অনুষ্ঠানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ছিলো না ("একজন লোক একটি ভোট"--এই নীতি চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটির বাদ পড়াটা তাৎপর্যপূর্ণ)।

(৩) দেশের দু'অংশের মধ্যেকার পরিবহণ এবং দেশের দু'অংশের মধ্যেকার ডাক-সার্ভিস আন্তর্জাতিক ডাক-সার্ভিসের কোন উল্লেখ ছিলো না।

এ-সব বিষয়ে আওয়ামী লীগ টীম তাদের মনোভাব পরিবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ খসড়ায় কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থাই ছিলো না। এমন কি তাদের নিজের খসড়াই উল্লেখ করা কেন্দ্রীয় বিষয়-সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যও কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। আওয়ামী লীগ আরো দুটি ধারাও যোগ করেছিলেন ধারা দুটি হচ্ছে:

(১) প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৭০-৭১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বরাদ্দ এবং প্রদেশের সম্পদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে কেন্দ্রকে তা পূরণ করতে হবে। যদিও কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে কর আদায় করবেন না।

(২) আওয়ামী লীগ টীম আরো বলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ যদি ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের বাইরে যায় তাহলে প্রদেশসমূহ কর্তৃক নির্দিষ্ট শতকরা হারে কেন্দ্রকে অর্থ সরবরাহের নীতিও মেনে নেয়া হবে না।

প্রেসিডেন্টের টীম বলেন, যে স্বীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি এই যে, কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা কর বসানোর ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত।

আওয়ামী লীগ খসড়ায় আরো বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ষ্টেট ব্যাংক থাকবে এবং তা' প্রাদেশিক আইন পরিষদের তৈরী আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। ফেডারেল ষ্টেট ব্যাংকের হাতে মাত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্তব্য রাখার প্রস্তাব করা হয়। এ-সব কর্তব্য হচ্ছে:

(১) টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করা।

(২) পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের অনুরোধক্রমে নোট ইস্যু করা।

(৩) টাঁকশাল এবং সিকিউরিটি-ছাপাখানা সম্পর্কে ব্যবস্থা করা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা।

(৪) আন্তর্জাতিক অর্থ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফেডারেল ষ্টেট ব্যাংক সেইসব কর্তব্য পালন করবেন যা সচরাচর করা হয়ে থাকে--এই শর্তে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ষ্টেট ব্যাংকের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ-সব কর্তব্য পালন করা হবে।

(৫) আওয়ামী লীগ খসড়ার অনুচ্ছেদ ১৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৭(১) একত্রে পাঠ করলে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ৯ই এপ্রিল নাগাদ অর্থাৎ মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাবের কোন রকম সংশোধন বিবেচনা করতে রাজী ছিলেন না।

আওয়ামী লীগের ঘোষণায় ("তালিকা" দ্রষ্টব্য) ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ১৪টি অনুচ্ছেদ বাদ দেয়ার প্রস্তাব ছিলো। অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ এবং ১৩১-এর ২ নম্বর ধারা এতে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নম্বর ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬ এবং ২৯২ সংশোধন করা হয় এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা আরো দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত নতুন কতকগুলো অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। এতে এই ব্যবস্থা ছিলো যে কেন্দ্রই আইন পরিষদ কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিষয়েও আইন পাশ করতে পারবেন। এ-সব ক্ষেত্র হচ্ছে:

(ক) যখন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতাসহ পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

(গ) যে-কোন ব্যাপারে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা অর্জনের প্রয়োজন।

এমন কি উপরোক্ত "ক" ক্ষেত্রের বেলায়ও তাদের মত পরিবর্তন করতে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান।

প্রেসিডেন্টের টীম উল্লেখ করেন যে ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে কাজ করা। আওয়ামী লীগের সব দাবীই এতে মেনে নেয়া হয়নি। এর উপর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন, সময় চলে যাচ্ছে, তাই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই সময়ের শেষে ঘোষণা প্রকাশ করা হলে তা হবে 'অতি বিলম্বিত'। তাঁকে জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগের

প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে অন্যান্য ফেডারেটিং ইউনিটের বিভিন্ন পার্লামেন্টারী দলের সঙ্গে পরামর্শ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেন যে, সব রাজনৈতিক নেতার মতৈক্য অত্যাবশ্যক।

একই দিনে খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যায় জনাব মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, জনাব সরদার শওকত হায়াৎ, জনাব মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং শাহ আহমদ নূরানীও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিতে আনার ব্যাপারে তাঁদের ব্যর্থতার কথা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, তিনি (শেখ মুজিব) আওয়ামী লীগের স্কীমের কোন পরিবর্তন মেনে নিতে পারবেন না।

এর আগে সকালের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মার্চ পাষ্টে বাংলাদেশের পতাকা উড়ান এবং বলেন, "আমাদের সংগ্রাম মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণার যথার্থতা এবং বৈধতার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কর্তব্য গ্রহণ করার কথা ছিল।

আওয়ামী লীগের সহকারীরা সন্ধ্যে ছ'টায় প্রেসিডেন্টের টীমের সঙ্গে আবার বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেন, "বৈঠকে আমাদের যা বক্তব্য তা আমরা সবই বলেছি।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের দিক থেকে আর কোন বৈঠকের প্রয়োজন নেই।" ("দি পিপল", ঢাকা ২৫শে মার্চ, ১৯৭১)

২৫শে মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা আর বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী নন। তাঁরা যে খসড়া ঘোষণা পেশ করেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্র কিংবা পাকিস্তান ফেডারেশন সংক্রান্ত কোন বন্দোবস্তের ব্যাপারে উৎসাহী নন। এর অর্থ হচ্ছে, এই খসড়া ঘোষণাটি ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশন তৈরী করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বিলোপ করবে, শেখ মুজিব পরলা মার্চ থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাচ্ছিলেন এই ঘোষণা তাকে আইনগত বৈধতা প্রদান করবে এবং আইনসিদ্ধ কোন বৈধতা ছাড়াই ঘোষণাটি জারী করে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত কথায় বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন:

"এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টারা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় আসবেন না বরং কোনক্রমে আমার কাছ

থেকে এমন একটা ঘোষণা প্রকাশ করিয়ে নিতে চান যা কার্যতঃ জাতীয় পরিষদকে দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত করবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের জন্ম দিবে এবং সামরিক আইনের ক্ষমতা বিলোপ করে দেশে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। বলাবাহুল্য, তার অর্থই হচ্ছে জাতির পিতা যে অর্থে পাকিস্তান তৈরী করেছিলেন তার সমাপ্তি টানা।"

এই সময়ে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৬শে মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনার কথা জানা গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস

রাজনৈতিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের প্রস্তুতিও সমাপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছিল। যা তারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় পেতে ব্যর্থ হতে পারে, তাকে জোর করে আদায় করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদীদের কলা-কৌশলের সাফল্য শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের সাহস বাড়িয়ে দিলো। তারা বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে বানচাল; ছাত্র-সমাজকে উত্তেজিত এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাঙ্গালীদের দলভুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। বিভিন্ন শহরে "সংগ্রাম পরিষদ" গড়ে উঠলো এবং কলেজের প্রাঙ্গণসমূহ সন্ত্রাসবাদীদের শিক্ষাশিবিরে পরিণত হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী এবং সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন এবং আন্দোলন শুরু করা হলো। বহু পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার আওয়ামী লীগ সমর্থক সৈনিক "দি সিপল" রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যভাবেই মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সব প্রস্তুতি নিয়ে, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের বৈঠক সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণাকে ছুঁতো হিসেবে ব্যবহার করে আরম্ভ করলো এক অরাজকতার আন্দোলন। এরপর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ শুরু করলো এক সন্ত্রাসের রাজত্ব।

১লা মার্চ, ১৯৭১

এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক ধর্মঘট আহ্বান করলেন। তাঁর ধর্মঘট আহ্বানের পর পরই আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা শহরের বিভিন্ন এলাকা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য বর্বরোচিত কার্যকলাপে মেতে উঠলো। তারা নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল ও জগন্নাথ হলে সশস্ত্র দল গড়ে উঠলো---তাদের কাজ ছিলো শহরে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী এবং অর্থ সংগ্রহ করা।

১লা মার্চ তারিখের রাত্রে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সর্বত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়ে গেলো।

২রা মার্চ, ১৯৭১

বায়তুল মোকাররমে দু'টি এবং নিউমার্কেটে একটি অস্ত্রের দোকান লুঠ করা হলো। লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। আগেই সেখানে একটি "গুলী চালানোর অনুশীলন কেন্দ্র" খোলা হয়েছিলো, সেখান থেকে সারা দিন গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যেতো। রাস্তার জনতা পাকিস্তান-বিরোধী শ্লোগান দিয়ে হাতে বন্দুক, লোহার ডাণ্ডা এবং লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। জিন্না এডিন্যুর ও বায়তুল মোকাররমে কয়েকটি দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শালিমার হোটেল এবং গুলিস্তান সিনেমা আক্রান্ত হলো। চালু রিক্সার উপর ইটপাটকেল ছোড়া হয়। নারায়ণগঞ্জের একটি পাটকল এবং ঢাকার ফার্ম গেট এলাকার বেসরকারী আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আর একটি সাংবাদিক সম্মেলন সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানায়। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীনই আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জবাব দেন---"আমার কোন মন্তব্য নেই।" তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তিনি এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে ৭ই মার্চের জনসভায় তিনি তার 'কার্য পরিকল্পনা' প্রকাশ করবেন।

ইতিমধ্যেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বাড়তেই থাকলো। বেসরকারী আইন-রক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের ব্যাপক গোলযোগ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলো। তাদের অনুরোধেই ব্যারাকে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে ডাকা হলো এবং রাতে কারফিউ জারী করা হয়।

ব্যাপকভাবে এই কারফিউ অমান্য করা হয়েছিলো। সদরঘাটে একটা সেনা ইউনিটের উপর জনতার আক্রমণের ফলে ৬ জন লোক নিহত হয়। সেনাবাহিনী যখন স্থানীয় টেলিভিশন ষ্টেশনটিকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তখন একজন লোক নিহিত হয়।

৩রা মার্চ, ১৯৭১

ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী এবং নবাবপুর সহ ঢাকার কয়েকটি এলাকায় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার দরুন বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ৫ জন লোক নিহত এবং ৬২ জন লোক আহত হয়। বেশ কিছু সংখ্যক দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া কিছু শহরবাসীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা মারা হয়। জিন্না এডিন্যুয়ের উপর একটা জেনারেল ষ্টোর ও একটি ঘড়ির দোকান আক্রমণ করা হয়। অস্ত্রের দোকানগুলো থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করা হয়। গোট পঞ্চাশেক ঘরে আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

ইতিমধ্যে প্রদেশের অন্যান্য অংশে জনতার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে। যশোরে, লাঠি, সোটা বর্শায় সজ্জিত হয়ে জনতা স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের রক্ষীরা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলী ছুঁড়লে দু'জন লোক নিহত এবং ৯ জন লোক আহত হয়।

সকালে ভৈরব থেকে লাকসাম গামী একটা স্থানীয় ট্রেন কুমিল্লার থামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।

লাকসামের কাছে দৌলতগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জেও হামলাকারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে প্রদেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আখাউড়া, সিলেট, হবিগঞ্জ এবং বিয়ানী বাজার এক্সচেঞ্জগুলিকেও জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগের নির্দেশ মতো ঢাকার রেডিও এবং টেলিভিশন নতুন এক বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত প্রচার করতে শুরু করে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা দেশের জনগণের অধিকার আদায়ের নামে সারা প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলন চালাবার কথা ঘোষণা করে।

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ রাতে চট্টগ্রাম ও খুলনায় গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অতর্কিত আক্রমণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বিক্ষুব্ধ জনতা wireless colony এবং শহরের অন্যান্য এলাকা আক্রমণ করে যথেচ্ছা 'লুঠ-তরাজ' অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং ধর্ষণ করেছিলো। ফিরোজশাহ কলোনীতে ৭০০ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসী পুরুষ মেয়ে, ও শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো তাদের হত্যা কিংবা গুরুতররূপে আহত করা হয়। ৩রা ও ৪ঠা মার্চে, যারা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল এবং যাদের ভস্মীভূত দেহ পরে পাওয়া যায় তারা ছাড়াও ৩শ'র বেশী লোক হত্যা ও আহত হয়।

যশোরে, খুলনা হতে আগত একটি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে যাত্রীদের টেনে বের করে হত্যা করা হয়েছিলো। যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে জনতা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয় এবং একটা হাত-বোমা নিক্ষেপ করে।

খুলনায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ঢাকার ধানমণ্ডী ও নবাবপুর রোড থেকে বেশ কিছু লুঠতরাজের খবর পাওয়া যায়। একটা অস্ত্রের দোকান আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়।

৫ই মার্চ, ১৯৭১

চট্টগ্রাম থেকে হত্যা এবং বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেবার খবর পাওয়া যায়। খুলনার খালিশপুরে ও দৌলতপুর এলাকায় ৫৭ জন লোককে হাত বোমা, দা এবং বর্শা দিয়ে